কবিতা বকেল

১৪ই এপ্রিল ২০১১

স্বাধীনতা ও বৈশাখ

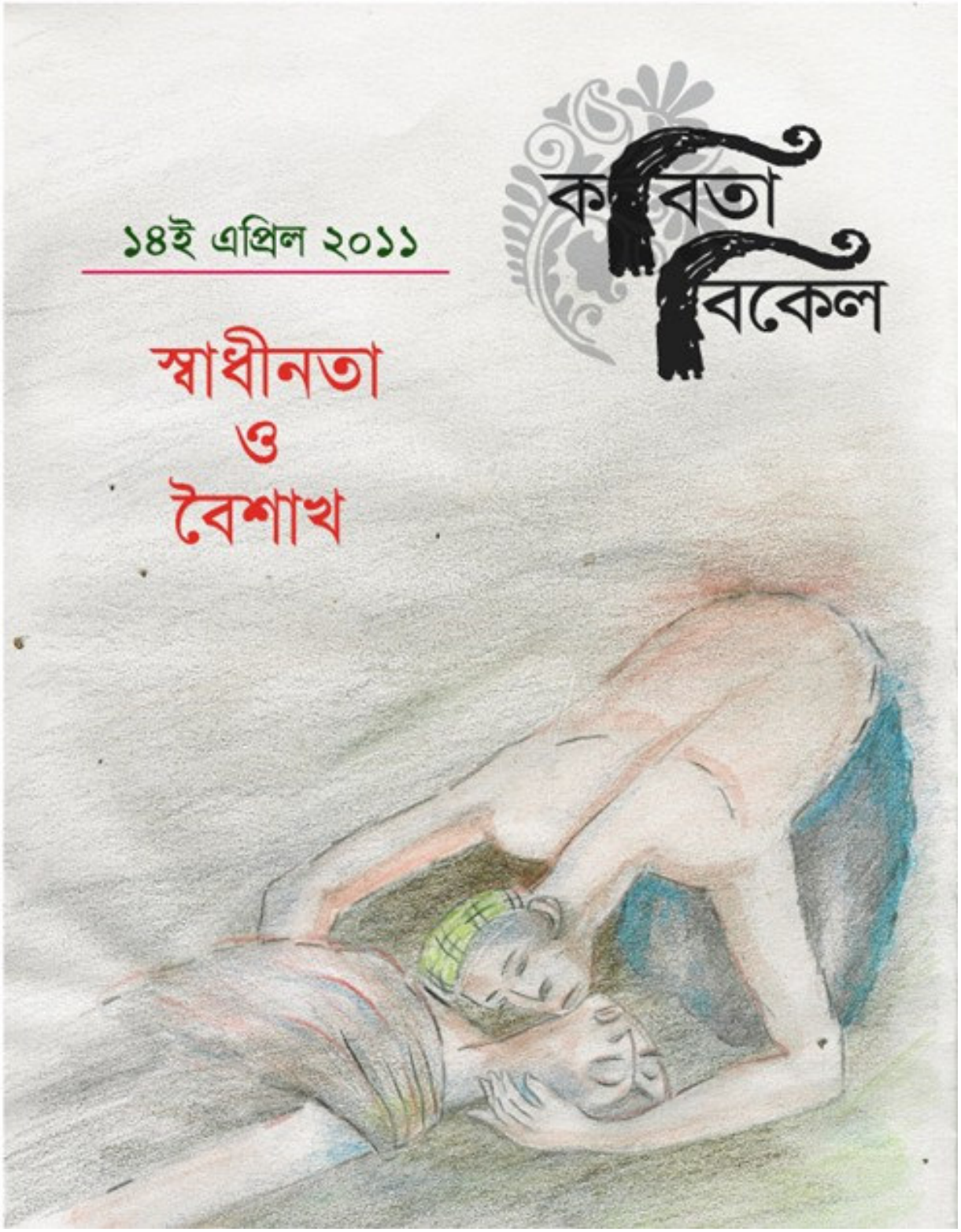

সম্পাদকের কথা – কাব্যঃ

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা ——-
এক পৃথিবী তুল্য
চড়া দামে কেনা সে -
প্রেম, প্রত্যয়, জীবন, সম্ভ্রম
অযুত নিযুত সমর্পন ।
সে ঝর্নাধারার উৎস সময়ের
নিরন্তর দাবী ।
মুক্তির স্বাদ, মুক্তোভুমির সাধ
সেকি শুধু একটি দিনের ধারণ?
একটি তারিখের লিখন?
নাকি শুধুই একটি সৃতিসৌধ?
চার দশকের কালগুনে -
যেন নিঃস্ব তার আদর্শ,
অন্নগোলা শুন্যতার প্রতীক,
শিক্ষার যন্ত্র ষড়যন্ত্রের কব্জায় ।
তবুও মুক্তি জ্বলে আলোয় আলো ।
সকল অহংকারের মাঝে বাজে আশার বীন
আসবে সুদিন, আসছে সুদিন - আশায় আশায় —-
স্বাধীনতা এক গোলাপ ফোটানো দিন ।

বৈশাখ

বৈশাখ ———
কালেশ্বরী।
মুক্তির জন্মাবধী বার্ষিক গতির
হিসেব ! সে তো
সহজিয়া সরল সমীক্ষা ।
বৃক্ষ কি রেখেছে তার শাখার পল্লবে ?
নদী কি গিয়েছে ঘুরে নতুনের প্রশাখায়
লিপিকার অপেক্ষায় ?
মৃত্তিকায় রক্তের লিখনে
গাঢ় গূঢ় নৃতত্বে -
চার দশকের বৈশাখ ।
কালেশ্বরী চেয়ে দ্যাখো -
তোমার গলায় দোলে মতিহার
ঠিক ৪০টি সাফল্য শোভায়,
পায়ের মলে বাজে ৪০টি ঘুঙ্গুর
দ্রিমিকি দ্রিমিকি তালে রুন-ঝুন ।

খোপায় ৪০টি তারার ফুল
যেন বিজলীর চমক ।
চার দশকের বৈশাখ ।
তাপস নিঃস্বাস বায়ে, ওই আসে ওই আসে
বাজিয়ে বীন, দীপক তানে ।

বর্ষের বয়স বাড়ে বৈশাখে,
কালের কালান্তর আনে
কালবোশেখ ।
মুক্তিদিনের বয়স বাড়ে মার্চে ।
কিন্তু প্রগতির বয়স বাড়েনা ।
বিশ্ব-সমীক্ষায় উলটোদিকেই এগিয়ে
অর্থনীতির অর্থে ।

আজ জ্বালাবো ৪০টি ভরসার প্রদীপ
যে রশ্মি ছড়াবে দিগ্বিদিক -
মুক্তির বিশাখে সুবর্ণ ব-দ্বীপ,
নিরুপমা দেশ, অনুপম কাল, পাত্র অনীক ।
তাপস নিঃশাস বায়ে
মুক্তির মুক্তো ছড়ায়ে ।

স্বাধীনতা ও বৈশাখ-২০১১

কবিতা বিকেল এর তৃতীয় প্রকাশনা

সম্পাদনায়ঃ মাহমুদা রুনু
প্রচ্ছদেঃ আশীষ ভট্টাচার্য্য
সৌজন্যেঃ আনিসুর রহমান (www.bangla-sydney.com)

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেনঃ

ডঃ আব্দুর রাযযাক
সিরাজুস সালেকিন
ডঃ মমতা চৌধুরী
রাজন নন্দী
আশীষ ভট্টাচার্য্য
আল নোমান শামীম
আজাদুল আলম
মাহমুদা রুনু
আফ্রিদা মামুন

পহেলা বোশেখে স্বদেশ ভাবনা

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

অতি সাধারণ বাঙ্গালী আমি; আছি এই পরবাসে
আজ বোশেখের প্রথম প্রভাতে কত কি যে মনে আসে।
দেশছাড়া আমি সে তো বহুকাল, তবু ও হৃদয় জুড়ে`
রয়েছে স্বদেশ; শয়নে, স্বপনে, তার কথা মনে পড়ে।

আমি কবি নই, তবু মাঝে সাঝে বাংলায় লিখি পদ্য;
মনে মনে ভাবি, আমার ছন্দ হয় যেন অনবদ্য।
ঋতু, অনুভব, ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, প্রেম, প্রীতি,
জায়া, জননী বা স্বদেশের প্রেম; ভুলে যাওয়া কোন স্মৃতি।

গায়ক ও আমি না, গাইতে শিখিনি, তবু বাংলার গান
ভালবেসে শুনি; পাই তাতে আমি আনন্দ অফুরান ।
মিলন, বিরহ, জীবনের গান, যে গানে মানুষ জাগে;
ঠুমরী, দাদরা,বেহাগ, ভৈঁরো; হোক না যে কোন রাগে।

শিল্পী ও নই, নই ভাস্কর, পটুয়া, চিত্রকর;
আপনার গুণে নমস্য এরা; স্বপ্নের কারিগর।
যুগ যুগ ধরে আপনারে দহি আঁধারে জ্বালান আলো;
নেন না কিছুই, দিয়ে যান শুধু দেশটাকে বেসে ভালো।

বাংলা মায়ের কোটি সন্তান কত কি তাদের পেশা;
কেউ জেলে, কেউ কৃষক, ফড়িয়া, কেউ রাজনীতি ঘেঁষা;
কেউ শিক্ষক, ডাক্তার কেউ, কেউ ফুল বেঁচে খায়;
কেউ বিচারক, উকিল, মুহুরী, কেউ গাংগে নাও বায়।
আমি কি সত্যি আমার দেশের সবাইকে ভালবাসি?
কঠিন প্রশ্ন; কেন যে তা আজ সামনে দাঁড়ালো আসি!
অবাক কান্ড, ভাবতে হলোনা, মন দিল দ্রুত সাড়া-

‘তুমি ঘৃনা কর প্রতিহিংসার রাজনীতি করে যারা
দেশকে বানিয়ে আপন উঠোন করে তাকে ছারখার
গণতন্ত্রের লেবাসে যে নেতা চালায় স্বৈরাচার।’

বিশ্ববিদ্যালয়

রাজন নন্দী

বিশ্ববিদ্যালয় নেমে এলে রাজপথে
দ্রুত আগুন জ্বলে উঠে কোটি বুকে
দাবানল, দাবানল ।
কেঁপে উঠে শাসকের দম্ভ ।
বুকে তাক করা বন্দুকের নলেরা নতমুখে ফিরে যায়,
ব্যারাকের নিরাপত্তায় ।

আমরা আগেও দেখেছি -
মজে যাওয়া রক্তের শরীর,
জরুরী ব্যবস্থায় সঙ্কুচিত জীবন ও স্বদেশ ।
অকস্মাৎ চকিত হোয়েছে দ্রোহে
যতবার বিশ্ববিদ্যালয় নেমে এসেছে রাজপথে;
প্রতিবাদে ।

লক্ষ কণ্ঠে যখন বিদ্রোহের কোরাস,
কোটিহাত যখন হয় মুষ্টিবদ্ধ ।
তখন কে থাকে ঘরে,
কে আর আপেক্ষায় থেকে সময়ের !

সময়ের দুর্গ হোয়ে উঠে হাতে হাত রেখে চলা মানুষের শরীর ।
যার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আছে হার না মানার ইতিহাস,
দাবানল হোয়ে উঠার অদ্ভুত কৌশল যার আছে জানা ;
তাকে কে পরাবে শৃঙ্খল আবার !

তাই বিশ্ববিদ্যালয় নেমে এলে রাজপথে -
কেঁপে উঠে শাসকের দম্ভ ।
বুকে তাক করা বন্দুকের নলেরা নতমুখে ফিরে যায়,
ব্যারাকের নিরাপত্তায় ।
আমরা আগেও দেখেছি
বন্দুকের নল আমাদের বশে রাখতে পারেনি বেশিদিন ।

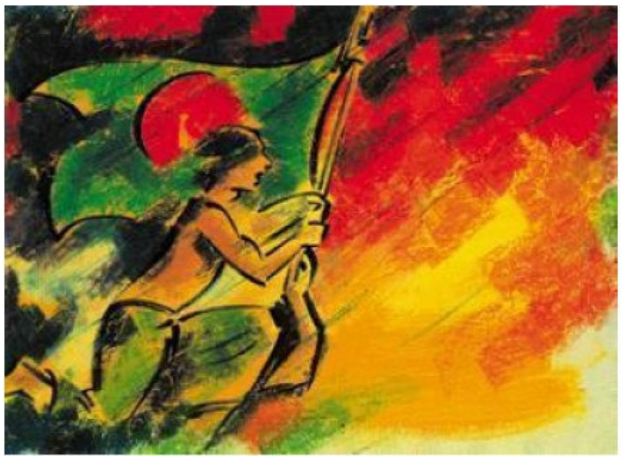

তোমাদের কথা কেউ কবেনা

সিরাজুস সালেকিন

আজ থেকে ৪০ বছর আগে আমরা অর্জন করেছিলাম আমাদের স্বাধীনতা। কি বিপুল ত্যাগ আর অশ্রুর বিনিময়েই না ছিল সেই অর্জন। ২৫শে মার্চের এক রাতের হত্যাকান্ডেই প্রাণ দিয়েছিল ৫০ হাজার নিরীহ বাঙালি। মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে তারা শাসন করতে চেয়েছিল বাঙালিকে। ভাই হারালো বোন, বাবা-মা হারালো সন্তান, সম্ভ্রম হারালো লাখো মা-বোন। ফলে এই অমানবিক হত্যা ও অনাচারের প্রতিবাদে ঝাপিয়ে পরলো সব শ্রেণীর বাঙালি, বাঙালি, হাতে তূলে নিল অস্ত্র, শুরু হোলো বাংলাকে মুক্ত করার জনযুদ্ধ। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম। কিন্তু এই স্বাধীনতা অনেকের জীবন পুরোপুরি বদলে দিল।

সময়টা ১৯৭৬ সাল। দেশের অবস্থা তখন খুব একটা ভালো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হয়েছেন কিছুদিন আগে। এর পরেই নিহত হলেন চার জাতীয় নেতা। এর মধ্যে তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন আমার স্বপ্নের মানুষ। তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর তাঁর সততা ও সাধারন জীবন-যাপন আমাদেরকে আকৃষ্ট করতো। তিনি ছিলেন আমাদের চে গুয়েভারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছি, পড়াশোনা তেমন একটা হচ্ছেনা। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো।

আমি তখন নজরুল একাডেমীতে গান শিখি। নতুন অনেক বন্ধু হোলো ওখানে গান শেখার সুবাদে। এর মধ্যে শিবলী নামে গীটারের এক ছাত্রের সাথে সখ্যতাটা যেন একটু বেশী। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, মতিঝিল এলাকায় থাকতো, বেশ বড় এবং পুরোনো এক মটর সাইকেল, খুব সম্ভব হারলি ডেভিডসন নিয়ে আসতো। ওটাতে চড়ার লোভেই হয়তো বন্ধুত্বটা একটু বেশীই হোলো। ক্লাশ শেষ করে মাঝে মাঝে আমরা মগবাজার ক্যাফে ডি তাজ এ কাবাব-পরাটা খেতে যেতাম ওর মটর সাইকেলে চড়ে। একটা জিনিস লক্ষ করতাম যে শিবলী খুব অস্থির। জানতাম যে ও একজন মুক্তিযোদ্ধা, আর পড়াশোনা এখন আর করছেনা। কি যেন একটা অস্থিরতা সবসময় ওকে তাড়া করে ফিরতো। একটুতেই রেগে যেত। সবাই সমীহ করে চলতো শিবলীকে। কিন্তু একমাত্র আমার সাথেই ছিল ওর প্রাণখোলা এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

এ সময় আমরা লক্ষ করলাম যে বঙ্গবন্ধুর খুনীরা ও তার সহযোগীরা তখনকার এক বিখ্যাত কবির বাসায় আনাগোনা করতো। এই কবি ছিল পাকিস্তানপন্থী। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এক নামকরা শিল্পীও এ সময় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেছিল। সেই শিল্পীর যাতায়াত ছিল ওই কবির বাসায়। ও স্থানীয় লোকজনও এটা লক্ষ করেছে, তবে ভয়ে কিছু করতে পারছে না। আমি একদিন শিবলীকে বললাম ব্যাপারটা। ও খুব উত্তেজিত হয়ে গেল, বললো, দোস্ত চল, কবিটাকে শেষ করে দেই। কিন্তু কিভাবে কাজটা করবো, তাই চিন্তা করতে লাগলাম। শিবলীর বললো যে ওর কাছে কয়েকটা গ্রেনেড আছে, খুব সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। ও বললো ওই একটা গ্রেনেড ওই কবির অফিসরুমে ছুড়ে দিলেই কেল্লা ফতে। কিন্তু তার আগে ওগুলো পরীক্ষা করা দরকার - ওগুলো ফাটে কি না। আমরা দু'জনে মিলে একদিন সন্ধ্যার দিকে খিলগা তালতলা এলাকার এক ইটের পাজায় গিয়ে ছুড়ে মারলাম একটা গ্রেনেড, অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পরও ওটা ফাটলো না। আরো একটা ছুড়ে মারলাম, মাথা নিচু করে আপেক্ষা করতে লাগলাম - কখন ওটা ফাটে - এবারও ওটা ফাটলো না। মন খারাপ করে বাসায় ফিরে আসলাম। কাজটা আর করা হোলো না। পরে অবশ্য ওই কবি আসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।

শিবলীর সাথে যোগাযোগটা রয়েই গেল। একদিন ক্লাশ শেষে ওর সাথে বসে ওর মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনছিলাম। ৭১ এর এপ্রিলে ওর বাবাকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, এরপরই ও যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে যাবার আগে মতিঝিল এলাকারই একটি মেয়ের সাথে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই প্রথমে ওর পরিবারের খোজ করতে লাগলো। খবর পাওয়া গেল ওর বাবা আর ফিরে আসেন নি, মা আর শিবলীর ছোট ভাই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছে। এর পর শিবলী সেই মেয়েটিকে খুজতে বের হোলো। মেয়েটির বাসায় গিয়ে দেখলো ওখানে কেউ নেই। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলো অক্টোবরের কোন এক সময় সেই মেয়েটিকে পাকিস্তানী সেনারা বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেছে। এর পর মেয়েটির পরিবার কোথায় ফেছে, তা তারা জানে না। ১৯৭১ এর ১৮ই ডিসেম্বর রাতে ওর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা শিবলীকে খবর দিল যে রাজারবাগ এলাকায় বেশ কিছু ট্রেঞ্চ থেকে মেয়েদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সারারাত সমস্ত রাজারবাগ এলাকা চষে ফিরলো শিবলী আর ওর সহযোদ্ধারা, টর্চ জ্বেলে খুজতে লাগলো তার প্রেমিকাকে। অবশেষে দেখা মিললো তার মনের মানুষের। একটা গর্তে উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে আরো কয়েকটি লাশের সাথে। পিপড়ার সারি তার নাক দিয়ে ঢুকে কান দিয়ে বের হচ্ছে। সমস্ত শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন। স্থানীয় লোকরা ও তার বন্ধুরা মৃতদেহ উদ্ধার করে মতিঝিল এলাকায় নিয়ে আসে। বন্ধুরা মেয়েটির পরিবারকে খুজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না ওদের। পরের দিন এলাকার লোকজন জানাজা পড়িয়ে আজিমপুর কবরস্তানে দাফন করে আসে। এই হোলো শিবলীর ৭১ এর দিনলিপি।

৪ বছর নজরুল একাডেমীতে গান শিখে ভর্ত্তি হোলাম ছায়ানটে। এর পর থেকে শিবলীর সাথে যোগাযোগটা কমে এলো। বেশ কয়েকবছর পরে এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে শিবলী আর নেই। বেশ কিছুদিন জ্বরে ভুগে, বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে অকালে মরলো আমার বন্ধু শিবলী। খবরটা পেয়ে শিবলীর মতিঝিলের বাসায় গিয়ে জানলাম ওর মা আর ভাই বাসা ছেড়ে কোথায় জানি চলে গেছে, কেউ বলতে পারলো না। নিজেকে ভীষন অপরাধী মনে হোলো শিবলীর খোজখবর নিতে পারিনি বলে।

আজো গভীর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় - শিবলীর কথা মনে হয়। যখন দেখি বাংলাদেশে ২৫ হাজার টাকায় শাহরুখ খানের কনসার্টের টিকিট বিক্রি হয়, তখন মনে হয় আর একটা যুদ্ধের প্রয়োজন। মনে হয় কাদের বাংলাদেশ এটা, কোন সে বাঙালি ২৫ হাজার টাকায় মজা লোটে? এরা কারা? যে দেশটা স্বাধীন করতে শিবলীর প্রেমিকার মত

লাখো মা-বোন প্রান দিয়েছে, সম্ভ্রম হারিয়েছে - এরা কি সেই দেশেরই সন্তান? বলিহারি যাই আমাদের দেশের কর্তাব্যাক্তিদের রুচিবোধ দেখে। বাংলা ভাষায় বিনোদন যেন আর ওদের ভালো লাগে না। হিন্দি ভাষাটা যেন ওদের বেশী কাছের মনে হয়। ধিক এই রাষ্ট্রপ্রধানদের, মন্ত্রীদের আর ভূলতে বসা বাঙালি জেনারেশনদের!!! ওরা কাদের জন্ম - তা নির্নয় ন জানি!! মনে পড়ে আলতাফ মাহমুদের কথা, বদি, রুমি, জুয়েল এর মত লক্ষ মুক্তিসেনার কথা - যারা প্রাণ দিয়েছিল বাঙালির দেশ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান জন্য। আজকে সেই দেশে এসব বিজাতীয় আয়োজন দেখে দু:খ হয়, লজ্জা বোধ করি মনে মনে। ওদেরকে বলি - আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও - আমরা তোমাদের আত্মদানের কথা ভূলতে বসেছি। কামনা করি আগামী প্রজন্ম এ অশনি সংকেত এর কথা ভুলবে না। বাংলাদেশ নামে একটি সত্যদেশ তৈরী করবে ওরা, প্রগতির জন্য আপোষহীন হবে, স্বাধীনতার সপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিধাহীন হবে। আর চেতনাহীন-রুচিহীনদের নিশ্চিহ্ন করবে শঙ্কাহীন হয়ে।

আসলে মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক পরিবারের ওপর দিয়েই এরকম অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কত পরিবার যে আসহায়ভাবে ধুকে ধুকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমরা তার কোন খবরই রাখিনি, হয়তো জানতেও পারিনি। একটা দেশের মুক্তিযুদ্ধ যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এই একমাত্র ঘটনা দিয়েই বোধকরি অনুভব করা যায়। আমরা যেন এই সব পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে যাই - যার যতটুকু সামর্থ - তাই দিয়ে যেন ওদের শুন্যতা দূর করার চেষ্টা করি।

স্বাধীনতা ২০১১

মমতা চৌধুরী

লাখো শহীদের রক্তের রাঙ্গা তিলক পরে,
স্বাধীনতা, তুমি এলে দীপ্ত পদভরে।
মুক্তিকামী জনতার শুদ্ধতম চেতনার রঙ্গে,
একাত্তরের প্রতূষ্যে ফুটলে, তুমি, একটি লাল গোলাপ হয়ে॥

বিশ্ব মানচিত্রে খোদিত হল ‘বাংলাদেশ’ এক অবাক বিস্ময়ে,

বাংলা মায়ের সন্তানেরা লিখলো এ নাম বিজয় গৌরবে।
বিস্মৃতির ওপাড় থেকে আজো ভেসে আসে
রুমি, ফারুক, জহির, বাবুল, নয়ন আরো কত নাম,

যাদের ত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি মোরা এই পবিত্র ধাম।
একে একে কেটে গেলো চার দশক সময় চক্রে-
আলো নেভা চোখে আজো এক বাবা প্রতীক্ষা করে,
তরুণ পিতার বুক জুড়ে কত আশা, কত স্বপ্ন ছিল তাকে ঘিরে,
ফিরবে তার দামাল ছেলে, যুদ্ধ শেষে, চারদিক সচকিত করে।

লিখেছিল শেষ চিঠে, 'ক্ষমা করো, বাবা, মোরে-
যদি ব্যথা পাও, সব সাধ স্বপ্ন ভঙ্গের অপরাধে।
পারিনি রাখতে রুধে নিজেকে চেতনার ডাকে,
দলে দলে চলেছে যেথায় জনতা দেশ মাতৃকার সম্মান বাঁচাতে,
আমাকেও যে যেতে হলো সকল মমতার বাঁধন ছিঁড়ে॥

মোর রক্তের ঋণে শোধ যদি হয় তাঁর বঞ্চনার ব্যথা,
'শহীদে'র পিতার সম্মান হবে তব পরিচয় লেখা।
প্রার্থনা কর পারি যেন ফিরতে 'গাজী' হয়ে
মোর বাংলা মায়ের কোলে, তব মুখ উজ্জ্বল করে॥

ষোল বছরের ফারুক আসেনি কভু আর ফিরে,
বুকের তাজা রক্তে লাল সূর্য এঁকেছে সে সবুজের বুক জুড়ে।
গাজী নয়, শহীদ নয়, নয় কোন সম্মান প্রত্যাশা,
প্রহরে প্রহরে প্রতীক্ষা করে শুধু বাবা একজনা
শুধু একবার স্পর্শ করতে সেই পবিত্র অংগ প্রাণ ভরে॥

গোধুলির আলো নিভে রাত্রি নামে যখন বাংলার মাঠে, বাটে,
উজ্জ্বল নক্ষত্রের রূপে জেগে উঠে তাঁরা আকাশ ভরে,
'কাল পুরুষ' হয়ে অনিরুদ্ধ প্রহরীর মত,
মন মন্দিরে দিশা হয়ে রবে তাঁরা অনন্ত অবিরত॥

স্বাধীনতা, ওগো মোর, চির আরদ্ধ স্বাধীনতা,
বুকে জ্বলুক দাউ দাউ করে তোমার একাত্তরের চেতনা।
যে সব বীরের জীবনাঞ্জলীতে পেয়েছি মোরা এই অহংকারের দান,
সেই সব লাখো মুক্তিযোদ্ধা আর শহীদের আত্মত্যাগি ঋণ,
অযুত শ্রদ্ধায় ঝংকৃত হোক প্রতিদিন মোদের হৃদয়ের বীণ॥

কলমের খোঁচার একথা ওকথা

আল নোমান শামীম

এখানে মহাপ্রলয়ের প্রলয় ঘন্টা
বেজে ওঠে মৃতদের সাথে
গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা
পাঁজরে গেথে ভীষন প্রতিধ্বনী
তোমরা ঘুমাও, ঘুমিয়ে থাকো
শ্মশানে জেগে উঠুক অতৃপ্ত আত্মারা
গ্রাস করুক আমায় এবং আমাদের ।
কেননা বিষাদ রাত্রি পেরিয়ে
এখনো আসেনি কালের বোকারা
এখনো হয়নি সময় সভ্যতার এবং
সভ্যতার নামে গড়ে ওঠার
হৃদয় নিংড়ানো নিকানো উঠোন
এখনো আমাদের ভাষা হয়নি
ভাষার অলংকার অথবা অহংবোধ
বলেই হয়তোবা মাঝে মাঝেই
এই মুক কলমের খোঁচার
একথা-ওকথা
অপেক্ষার স্বেতপরা দেয়ালে
কেবলি শুনি দ্বিপ্রহরের করুন বিলাপ,
বিড়ান হাজার শতাব্দী
দাড়িয়ে থাকার কি অবাক স্বপ্ন নিয়ে
বৃথাই জন্মাবার প্রহসন আমাদের ।

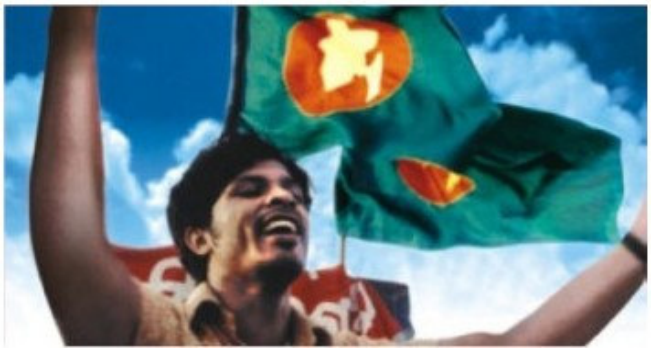

অলংঘনীয়

রাজন নন্দী

হাসপাতালের বেড থেকে একজন উঠে এলেন,
মৃত্যুঞ্জয়ী; অবয়বে তার নব জীবনের স্ফুরন ।
স্বপ্নের হাত ধরে সুস্থতার প্লাটফর্মে যেন
ফিরে এলেন জীবনের সীমান্ত লংঘনকারী ।
আবার হয়তো তাকে দেখা যাবে
সুর্যকরোজ্জল পৃথিবীর রৌদ্র বিবাগী ,
গোধুলীর সময় রিস্টেওয়াচে চক্ষুস্থির ; চিন্তিত ।
পৌষ সংক্রান্তির পৌঢ় রাত্রিতে,
শীতে ঠকঠক কেঁপে বাস্তুকে পিঠে দিতে ।
আকস্মাৎ কোন মরিচিকার পেছনে ভ্রান্ত হোলেও
তাকে নিশ্চিত দেখা যাবে তার প্রেমিকার সন্ধানে ।
এওভাবে জোবন যখন খুব স্বাভাবিক
তখনই ফিরে আসার সেই ক্ষণ আবার
সৃতির মন্দিরে করে ঘন্টাধ্বনি ।

একজন বৃদ্ধ ও তার দুই ছেলে

আশীষ ভট্টাচার্য্য

এটা একাত্তরের ডিসেম্বর নয়, মে মাসের কথা লিখছি। আর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে দেশে এতো বড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা আমাদের জানা ছিল না।

আমরা এক নৌকা মানুষ ফরিদপুরের এক গন্ডগ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছি ভারতের আগরতলার উদ্দেশ্যে। প্রায় তিনদিন জীবন আর মরনের দোলায় ভেসে নৌকা এসে থামলো এক গ্রামে। নৌকা তীরে বাধতে বাধতে মাঝি বললেন, ওইযে ধানক্ষেত দেখছেন তারপরেই একটা ছোট নদী। সেই নদীটা পেরোলেই ভারত সীমান্ত। সন্তর্পনে সবাই জলের বিছানা ছেড়ে মাটিতে পা রাখলাম। ছোট পা, বড় পা, কচি পা, তিরিশ জন মানুষের পা লাইন বেধে এগিয়ে চললো ধানক্ষেতের দিকে। বেশী পথ নয়। ছোট্ট গ্রামটার পাশদিয়ে ধানক্ষেতটা পেরোলেই হোল। হাওয়া নেই। নিস্পন্দ ধানের ক্ষেতে কবরের নিস্তব্দতা। কোথাও একটা কাক কা কা করে উঠলে মনে হয় একলক্ষ মানুষের আর্তনাদ। আমরা যখন ক্ষেতের মাঝামাঝি এসে পৌছেছি ঠিক তখন চারিদিক থেকে মেশিনগানের গুলি। কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। যে যেদিকে পারলো ছুটলো। এক মুহুর্তের মধ্যে তিরিশ জনের দল তিরিশ টুকরো হোয়ে ছিটকে পরলো বিভিন্ন দিকে। হুশ হুশ করে মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গুলি। আমি চোখ বুজে শুয়ে পরেছি ধানের বিছানায় একবুক কাদা বুকে নিয়ে।

এভাবে কতক্ষন শুয়ে ছিলাম জানিনা। এক সময় গুলি থামলো, স্তব্ধতায় ভরে গেল চারিদিক। চোখ মেলে দেখলাম আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। তারপর শুরু হোল খোজার পালা। গত মার্চ মাস থেকেই এই হারিয়ে যাওয়া আর খুজে বের করা এই খেলাই চলছে। এ খেলায় সবসময় সবাইকে খুজে পাওয়া যায়না। আমাদের এই তিরিশ জনের দলে সম্পুর্ন একটা পরিবারও নেই। কারো ভাই নেই, কারো মা নেই, কারো বোন নেই ওরা হারিয়ে গেছে। কোথায় আছে বেচে আছে কিনা তাও তারা জানেনা।

একে একে সবাই বেরিয়ে এলো ধানক্ষেতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কাদামাখা শরীর নিয়ে। একমাত্র জয়ন্ত দাসের ছেলে ভজা বেরিয়ে এলো রক্ত মাখা শরীরে। একটা বুলেট লেগেছে, বুকে নয় হাতে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার অস্তগামী সুর্যের লাল আভা মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে যাচ্ছে। সেই নিশ্চিহ্ন অন্ধকার পাড়ি দিতে কারো সাহস হোল না। দূরে যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে সে দিকেই হাটা শুরু করলাম। গ্রামের প্রথম দাওয়ায় বসে এক বৃদ্ধ

তামাক খাচ্ছিলেন। রক্তাক্ত ভজাকে দেখে তিনি ছুটে এলেন। তিরিশ জন ছিন্ন মানুষের রাত কাটানোর ব্যবস্থা হোল বৃদ্ধের বাড়িতে। তিনি একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন। রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করলেন। ভজার হাতে ব্যান্ডেজ বাধা হোল। গুলিটা হাড়ের মাংস ছিড়ে বেরিয়ে গেছে। হাড়ে লাগেনি তাই রক্ষা।

লক্ষ তারায় ভরে উঠলো রাতের আকাশ। চাঁদের জন্য এমনি একটা আকাশ চাই। চাঁদও উঠলো। জোনাকির টিপ পরা বৃদ্ধের বাড়ীর সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলো নিরিবিলিতে ধ্যানস্থ হোল। আরেকটি নিদ্রাহীন রাত। তিরিশজন মানুষ ভয়ে জরোসরো হয়ে বসে আছি। এককোনে টিপটিপ করে জলছে হারিকেন। সেই আলোতে কতটা রাত হোয়েছে বোঝা যায়না। পাশের ঘরে বৃদ্ধের দুই ছেলের কথা কানে এলো - এরা দেশের দুশমন এদেরকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যায়না। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে খবর দিতে হবে। এরা পাকিস্থানের সাথে গাদ্দারি করছে। অন্য ছেলেটি বল্লো চেয়ারম্যান লাগবেনা আমিই এদেরকে শেষ করে দিতে পারি।

হারিকেনের আলোতেই ঘরের মধ্যে আমাদের অস্থির আতঙ্ক পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। মৃত্যু বাইরে দাড়িয়ে। যে কোন মুহুর্তে দরজা খুলে প্রবেশ করবে ঘরে। হয়ত গুলি করবে অথবা কুপিয়ে মেরে ফেলবে আমাদের। বৃদ্ধের খক খক কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল। বৃদ্ধ বললেন - ওরা আমার মেহমান, আমার আশ্রয়ে আছে, এদের কোন অনিষ্ট তোমরা করতে পারবা না। অনেক রাইত হইছে ঘুমাইতে যাও।এমন রাত কাটি কাটি করেও কাটে না। সমস্ত কামনা এখন একটি ভোরের জন্য। ভোরের অস্পষ্ট আলো যার কাছে জোনাকি মনে হবে প্রদীপ। জীবন হাটবে শিশিরের পথ বেয়ে।

শেষ পর্যন্ত জানালার ফাক দিয়ে একটু হাল্কা আলো একমাত্র ঘুমিয়ে থাকা ছোট মেয়েটির মুখে এসে পরলো। বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে পথে নেমে এলাম। তার শীর্ন হাতদুটি ধরে বলতে পারিনি - আমাদের জীবন আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলো।

আমরা নেমে এসেছি ভোরের নরম মাটিতে। পথের পাশের রুক্ষ খেজুর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দুই ছেলে আমাদের চলে যাওয়া দেখছিল। কিছু কিছু মুখ আছে কখনও ভোলা যায়না। সেই ছিল আমার জীবনে দেখা প্রথম রাজাকার।

কী সর্বনাশা প্রলয়ে ভেসেছি সেই দিনগুলোতে। আজ ভাবতে বুক কাপে। সেটা ছিল অন্ধকার প্রলয়ের কাল। তারপর অনেক ঘটনার বুকে ভেলা ভাসিয়ে দেশ স্বাধীন হোল। এলো ১৬ই ডিসেম্বর। সেই বৃদ্ধের কথা কখনো মন থেকে মুছে যায়নি। খবর নেবারও চেস্টা করেছি। একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল। সম্ভব হয়নি। জেনেছিলাম দেশ স্বাধীন হবার আগেই উনি মারা গেছেন।

৯২ সালে যখন দেশে গিয়েছিলাম তখন বায়তুল মোকাররমে একটা মুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম। মুখটা সেই বৃদ্ধের দুইছেলের একজন। একটি মিছিলের সন্মুখভাগে। বেশ মোটা হোয়েছে। দাড়ি রেখেছে। দুই ভ্রুর মাঝে আঁচিলের মতো তিলটা এখনও আছে। এ মুখ আমি কখনো ভুলবো না। সেই বৃদ্ধের সাথে এর কোন মিল নেই। অথচ এমন একজন ইশ্বরের মতো পিতার পুত্র হোয়ে এরা জন্মেছিল।

বৈশাখী প্রনতি

মাহমুদা রুনু

তোমার নিবাস যেথা
সেথা হোতে ঘুরে গেছে নদী,
কালের কলতান এনেছে প্রাবল্য
সে মোহনার পারে ।
যেখানে প্রেম জ্বেলে দেয় অনন্ত হেমাগ্নি
অন্ধকারের পাথর পাথরে ঘষে
দেয় আলো -
সে আলোর পথযাত্রি
তুমি এসো নতুন নাবিক হোয়ে ।

আমাবস্যায়, পুর্নিমায়
রাতের ছোট্ট সাদা ফুলটির সুবাসকে কর
তীক্ষ্ণ চেতনার তরবারি ।
হোয়ে যাক তা
নিশ্চিত বিপ্লবের সতস্ফুর্ত শুরু ।
যে নদী ঘুরে যায় দক্ষিনে
স্রোতের খর-প্রবাহে তা প্রলয়ঙ্কর,
সে জলের রোহিত হোয়ে যায় মৎস জাহাজ,
ঝিনুকেরা ক্রমাগত জন্মাতে থাকে
দুর্মুল্য মুক্তো ।
কালবোশেখী ভীষন ভয়ঙ্কর জলের উচ্ছাসে
গড়ে একটি চর -
যেখান থেকে শুরু হবে
বিপ্লবের সুনামী ।
আমার কান সুদিনের বাতাসের শব্দ শুনছে,
চোখ দেখছে স্বপ্ন অন্যরকম এক ।

ঋনাত্বক শব্দগুলো ধনাত্বক,
নেইগুলো হয়ে যায় ‘এইতো আছে‘
কিছুই বিগত নয় ।
যেমন বিগত নয় ভাইটি
যার মুষ্টিবদ্ধ হাত হোয়েছিল
যুদ্ধের হাতিয়ার ।

দক্ষিনের সাগরময়ী উন্মত্ত উন্মুখ
ঢেলে দেয় অমৃত তার
তোমার মোহনায় ।
বীরশ্রেষ্ঠা বধু-মাতা-কন্যারা
বন্যাধারায় মিলেছে
নব-চরাচরে নব বৈশাখে ।
বীরাঙ্গনার মহিমান্বিত আলোকের
ঝর্নাধারায়
প্রাণবন্ত বৈশাখ ।
এখান থেকে শুরু হোক হালখাতা
মোহনার এপার হোতে
দুরন্ত বৈশাখী তোমার ।

নিরন্তর প্রবাহিত জলধীর
নবীন মাঝি, শক্ত হাতে ধর হাল
বধু-মাতা-কন্যার শাড়ির আচলে - পাল ।
নব বিপ্লবী যাত্রি নানা
যাত্রা তাদের নবচরাচরে
তোমারি দুয়ার হতে ।

এসো বন্ধু পরবাসী -
হৃদয় নিংড়ানো সবটুকু প্রেম দিয়ে
বেধে রাখি একটি মানচিত্র -
কর্মে ধর্মে ও শপথের শব্দে ।
মোহনার মোহিনী মোহন
জাগো নবচরাচরে নব প্রভাতের নব বৈশাখে
করো প্রনতি গ্রহন ।

অধীনতায় স্বাধীনতা

আজাদুল আলম

আমাকে প্রশ্ন করা হোল
বার বার কেন ফিরে আসেন এই ধুসর পল্লী পাড়াগায়ে ?
কেমন করে বুকে ভরে রাখেন এতো অকৃত্তিম ভালোবাসা ।
বেহুদা দাঙ্গায় পা হারালেন, বাবাকে হারালেন পার্টবাজ
মাস্তানদের হাতে,
ডেঙ্গুজড় প্রায় নিয়েই গিয়েছিল আপনার সোনামনিকে
এর পরেও এদেশে থাকেন কি করে?
আপনার সাধের বকুল তলা তো আর নেই,
বিস্তির্ন জামের বাগান এখন ইটের ভাটাবাড়ী ,
উদার দুপুরে বাশবনের উদরে, ঘুঘু তো আর ডাকেনা -
এর পরেও এই ধুলিময় জীর্ন জনপথ ভালোবাসেন কি করে?

প্রবাসের নিখুত পরিপাটি অট্টালিকা ছেড়ে -
এই মৃতপ্রায় তিস্তার তীরে বাসা বাধেন কি করে ?
শান্ত সুরে উত্তর দিলাম,
তবু ভালো লাগে অগনিত অমুল্য রক্তে কেনা আমার গ্রামের
ধুলিকনা ।
আছে মুক্তিযোদ্ধা গোবিন্দ কাকার মতো দেশী মানুষেরা,
আমার মায়ের সবুজ সাথীর সাথী,
চাচার গেরিলা যুদ্ধের যোদ্ধা গোবিন্দ কাকা ।
মেঠোপথে একপায়ে এগিয়ে আসে কাকা গোবিন্দ চরন
অতি সাধারণ কথা বলে অন্তরের গহীন থেকে,
দেশ যার ভালোবাসা, স্নেহ যার অক্ষের মায়ায় -
‘‘তোমাক দেখিবার আনু বাহে, আর কদ্দিন বাড়িত আসিবেন,

মরি যদি যাও -
তোমাক দেখিবার আনু বাহে, মন জুড়ি গেল -
আমার দেশের মানুষ কতো দুর থাকি আইসে -
মায়ের শিকরের বড় টান বাহে । ভালো আছেন বাহে ?“

আর কোথায় কে আছে বলো এমন ছলছল চোখে টেনে নেবে
অন্তরের কাছে?
কোথায় পাবে বলো এমন মুক্তিযোদ্ধার সান্নিধ্য
যার অধীনতায় তোমার আমার স্বাধীনতা ।
ভালোবাসবোনা কেন বলো?
প্রাণখুলে হাসবোনা কেন বলো ?
বারবার ফিরে আসবোনা কেন বলো ?

BOISHAKH

AFRIDA MAMUN PRIETA

A day of a new beginning
A day of celebration
A day of joy
A day of smiles
A day of happiness.

Boishakh is a day where I dress up
I gather with friends

I eat delicious foods
I surround myself with glorious things
I surround myself with the great Bengali culture
With melodious music
From habib to balam
To sarees to churis
To tips to earrings
To necklaces to nupurs .

I sing many songs
I dance to many beats
I eat Fuchka and puris
Luchis and kebabs
Fairy floss and candy
I share many laughs
I take many photos
I enjoy many programs and musicals
I give many hugs
I enjoy the moment and miraculous occasion of boishakh
With myself, family and friends of the Bengali community.